ভূমিকা

এবারের পটভূমিকা শ্রীক্ষেত্র — জগন্নাথের পুরী। এখানে শ্রীম কয়েকমাস ধরিয়া সাধু ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে বাস করেন শশীনিকেতনে। শ্রীম লীলাচঞ্চল। একদিকে সমুদ্রসৈকতে পাথর কুঠিতে একান্তে শ্রীম প্রত্যুষে তিনঘন্টা ধ্যান করেন এবং অপরাহ্নে পুনরায় দুইটা হইতে তিনঘন্টা একান্তে ধ্যানমগ্ন থাকেন। ভক্তরা কখনও কখনও সঙ্গোপনে গিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেন, শ্রীম সিদ্ধাসনে "সম-শির-গ্রীব-কায়ং" মুদ্রায় ধ্যানমগ্ন। চক্ষু নিমিলিত, যেন স্পন্দনহীন। কখনও ভক্তরা দেখিতেন, চক্ষুর দুই কোণ বহিয়া অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে ঝরণার মত। কখনও শরীর পুলকিত।

ইহার পরই উঠিয়া চলিলেন ঁজগন্নাথ দর্শনে। এক মাইলেরও অধিক দূরে। শ্রীম-র বয়স এখন বাহাত্তর। মন্দিরে ভক্তরা তাঁহার সঙ্গে অনেক সময়ই সঙ্গী হইতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, যাঁহারা জগন্নাথের মন্দিরে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এই দর্শন ও পরিক্রমা কত কঠিন। বৃদ্ধ শরীরে তিনঘন্টা গভীর ধ্যান করিয়া এক মাইল পায়ে হাঁটিয়া মন্দিরের পরিক্রমা কত শ্রমসাধ্য! যুবক ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা করিয়া অতি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু শ্রীম-র কখনও ক্লান্তিবোধ হইতে দেখি নাই।

শ্রীম-র দর্শন ও পরিক্রমা — সাধারণ লোকের দর্শন ও পরিক্রমা হইতে ভিন্ন। উন্নত ললাটের নিচে শালগ্রাম সদৃশ ভক্তিরসে আপ্লুত নয়নদ্বয় দেখিয়া মনে হইত ইহাতে ক্লান্তির লেশও নাই। অধিকন্তু আছে প্রেমরসে সিঞ্চিত হইয়া এক অপূর্ব মনপ্রাণ উন্নতকারী দৈবী আকর্ষণ। যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণ উহা দেখিয়া তাঁহাদের এই দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমাজনিত ক্লান্তি লজ্জায় দূর করিতেন। জগন্নাথ ও তাঁহার পার্শ্বদেবতাগণ মন্দিরের চারিদিকে অনেক। প্রতিটি স্থানে গ্রাম্য ও সরলবিশ্বাসী ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের মত প্রতিটি মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করিতেন। ভক্তরা ভাবিতেন, এই দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয় কত ভক্তি ও বিশ্বাসে। এই কথা ভাবিয়া তাঁহাদেরও দেহশ্রম দূর হইত। অন্ততঃ পঁচিশটির অধিক স্থানে এই প্রকার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, যুক্ত করে প্রার্থনা ও চরণামৃতাদি প্রসাদ ধারণ করিতেন। সাধারণ লোককে একবার দুইবার কেহ প্রসাদ দিলে বিরক্ত হইয়া যায়। একবার দুইবার হাঁটু গড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলে দম বাহির হইয়া যায়। কিন্তু এই বৃদ্ধ মহাপুরুষের আচরণ ঠিক বিপরীত। নানা মন্দিরে তিনি যতই এইরূপ প্রণাম পরিক্রমা প্রসাদ ধারণ করিতেন, ততই তাঁহার চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইত, মন যেন কোন্ দূর আনন্দময় ধামে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। এই বৃদ্ধ শরীরটা যেন মেসিনের মত দিব্যানন্দে মগ্ন মনের পিছনে পিছনে যাইতেছে। সাধারণ লোকের দেখি শরীরটা যেন মনটাকে চালনা করে। শ্রীম-র তাহার বিপরীত। মন শরীরকে চালনা করিতেছে।

শ্রীম কয়েক মাস ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। নিত্য তাঁহার এই প্রোগ্রাম। সকালে সমুদ্রতটে দীর্ঘকাল ধ্যান। তারপরই এই মন্দির-প্রণাম, প্রার্থনা ও পরিক্রমা। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত বাস করিয়াছেন, সেই সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ অবাক হইয়া ভাবিতেন, কোথা হইতে এই শক্তি, এই উদ্দীপনা আসিতেছে। শ্রীম-র দৈনন্দিন জীবন শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু এই মন্দিরদর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমার সময় এই যুবকের তেজ কি করিয়া এবং কোথা হইতে আসিত, ইহা যুবক ব্রহ্মচারীদের নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল।

যে সব সাধু ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার সহিত নির্জন মিহিজাম-আশ্রমে বাস করিতেন তাঁহারা দর্শনাদিতে শ্রীম-র এই প্রকার প্রচুর শক্তি প্রকাশের এই পরিচয় পান নাই। মিহিজামে তিনি ছিলেন যেন অরণ্যে সর্ব বাধাবিনির্মুক্ত সিংহ — একটি প্রাচীন ঋষি। মন সর্বদা অন্তর্মুখ, আর মৌন। যখনই মনকে নিচে নামাইয়া আনিতেন তখনই উহাকে উপনিষদ গীতাদি শাস্ত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত করিতেন, ভক্তগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত ব্যাখ্যা করিতেন। গভীর ধ্যান হইতে মনকে নামাইয়া ঈশ্বরীয় চিন্তার ভিতর দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে উদ্দীপিত করিতেন। এই পুরীধামে শ্রীম মিহিজামের অরণ্যের মত শুধু ধ্যানমগ্ন নন, তিনি

লীলাচঞ্চলও। শ্রীম বলেন, এখানকার সব ব্যবস্থা ভিন্নরূপ। সারাদিন দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা কর, আর সন্ধ্যায় অল্প ধ্যান ও চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পাঠ কর।

শ্রীমকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'পুরীতে আমিই জগন্নাথ।' ঠাকুরের জীবিত অবস্থাতেই পাঁচ ছয়বার তাঁহাকে পুরীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিতেন, 'পুরীতে আমার যাবার যো নেই। সেখানে গেলে আমার শরীর ত্যাগ হবে।' কেন? না, তাঁহার পূর্বাবতার চৈতন্যলীলার কথা স্মরণ হইয়া মহাভাবে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইবে। চৈতন্যদেব সেখানে চব্বিশ বৎসর কাল বাস করেন সন্ন্যাসের পর, মাতৃআজ্ঞায়। ইহার মধ্যে চার বৎসর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় তীর্থগুলিতে কাটান। শেষের আঠার বৎসর একটানা পুরীতে বাস করেন। তাহারও শেষের বার বৎসর একটানা মহাভাবে অতিবাহিত করেন। এই সব পূর্বস্মৃতি স্মরণ হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ত্যাগ হইবে। অথচ ঐখানকার পূর্বলীলার কথা ও জগন্নাথের সুসমাচারের জন্য প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইত। তাই শ্রীম-র মাধ্যমে ঐ সকল সংবাদ লইতেন। শ্রীম যে ঠাকুরের চৈতন্য-অবতারেরও অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন! এবারের রামকৃষ্ণ-অবতারেও অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট পার্ষদ, তাঁহার লীলা প্রচারের বেদব্যাস!

শ্রীম বলেন, এই পুরীতে যেমন একদিকে জলীয় সমুদ্র লবণাম্বু, অপরদিকে সূক্ষ্ম অদৃশ্যে প্রেমসমুদ্র বিদ্যমান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ এই প্রেমসমুদ্রের জমাটবাঁধা সাকার বিগ্রহ। চৈতন্যদেব নিত্য ঐ সাকার প্রেমবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন।

শ্রীম-র সঙ্গী সাধু ব্রহ্মচারীগণ দেখিতেন 'চক্রনয়ন'-বিচিত্র জগন্নাথ মূর্তি। শ্রীম দেখিতেন, সাক্ষাৎ চিন্ময় ভাবঘন ঠাকুরের মূর্তি! তাই কখনও ভক্তগণকে বলিতেন, যাহারা ধ্যান এবং শাস্ত্রাদিপাঠের রসিক তাহাদের যদি সাক্ষাতেই দর্শন হয়, ভগবান চক্ষের সম্মুখে, তবে কে যায় চক্ষু বুজিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁহাকে দেখিতে? তাই এসব স্থানের ভক্তগণ ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠে অত যত্নশীল নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ভগবানকে, সরল বিশ্বাস শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের পটভূমিকায়।

শ্রীমকে আমরা তিনটি ভাবে দর্শন করিয়াছি তিন স্থানে —

কলিকাতায়, মিহিজামে ও জগন্নাথ-পুরীতে। তিন স্থানেই শ্রীম-র ভিতরে একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব লক্ষিত হইত। বাহিরে স্থান বিশেষের পরিবর্তনে তিনটি বিভিন্ন ভাব দেখিতাম।

কলিকাতায় শ্রীম নিজ পরিবারে থাকিতেন। পরে মর্টন স্কুলের পরিচালনা আর অহর্নিশ ভক্তগণকে রামকৃষ্ণ-কথামৃত পরিবেশন। এই তিন অবস্থায়ও তাঁহার ভিতরে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, বাহিরে অবশ্য কর্মচঞ্চলতা। কিন্তু এই কর্মচঞ্চলতা অযুক্ত প্রাকৃত কর্মীদের চঞ্চলতা নহে। এই কর্মচঞ্চলতাও ঈশ্বরের নিষ্কাম সেবাভাবে মণ্ডিত। তাই উহা ভক্তগণের নিকট এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হইলেও শ্রীম-র মনের ভাব শান্ত ও সমাহিত । শুধু কি তাঁহার নিজেরই সমস্যা — পারিবারিক বা স্কুল পরিচালনার? অসংখ্য ভক্তগণেরও ধর্মজীবনের সমস্যার সমাধান শ্রীমকেই করিতে হইত। কোন ভক্ত হয়তো আত্মীয়জনের বিয়োগে শোকজর্জরিত। কেহ বা আর্থিক সঙ্কটে পতিত। কেহ কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ। কাহারও হয়তো কর্ম নাই, তাই অশান্ত। আবার কোন সাধক ভক্ত ধর্মপথে অগ্রসর হইতে দারুণ বাধ্যপ্রাপ্ত। কেহ বা সাংসারিক ও ধার্মিক সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্তমনা। কোন যুবক ভক্ত ত্যাগব্রত গ্রহণ করিতে উৎসুক কিন্তু সংস্কারজনিত তুচ্ছ বিষয়ে তাঁহার বিচারশক্তি রুদ্ধ। এইরূপ নানা সমস্যাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা তিনি সর্বদা বেষ্টিত। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাতেও তাঁহার অন্তরের প্রশান্ত গম্ভীর ভাবটি ব্যাহত হইতে দেখি নাই, বরং বাহ্য মনটিও ভগবদ্‌রসে মণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যাইত।

মিহিজামে তাঁহার রূপটি ভিন্ন। সেখানেও অন্তরের গভীরে ঐ প্রশান্ত গম্ভীর ভাবটি অব্যাহত । বাহিরে ঐ স্থানে সংসারী ভক্তগণের সমস্যা হইতে বিমুক্ত। সাধু ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের সাধনপথের সমস্যা থাকিলেও শ্রীম ঐ সমস্যা সমাধানে কলিকাতার ভক্তগণের সমস্যা সমাধানের মত বিব্রত নহেন। এই স্থানে ব্রহ্মচারীদিগকে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই দূর করিতে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাদিগকে নির্জনে অরণ্যে ধ্যানের জন্য একান্তে একা একা এক একবারে তিন চারঘন্টা করিয়া রাত্রি, প্রভাত ও অপরাহ্ণে পাঠাইয়া দিতেন। ধ্যানের সামগ্রী তিনি নিজে বলিয়া দিতেন

এক একজনকে এক এক প্রকার। নিজেদের মনের সহিত ভক্তগণ শ্রীম-র দ্বারা নির্দিষ্ট ঠাকুরের কথিত ধ্যানের সামগ্রীটির সহিত সংগ্রাম করিতেন। ঐ সময়ে কখনও ব্রহ্মচারীগণ নিরাশার অন্ধকারময় ভূমিতে নিপতিত হইতেন। কখনও ঠিক তাহার বিপরীত দিকে আশার মনোহর মূর্তিতে স্বীয় মন সংযোগ করিতেন। অরণ্য হইতে ফিরিয়া তাঁহারা শ্রীম-র সম্মুখে আসিলে, শ্রীম তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন এবং ঠাকুরের দুই একটি কথামৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের এই সংশয় নিরসন করিতেন। আর তাহাতে তাঁহাদের মন সরস হইত। ব্রহ্মচারীদের ঈশ্বরীয় পথের এই সকল সমস্যা নিরাকরণের সময়ও শ্রীম-র অন্তরের স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব সদাই অক্ষুণ্ণ থাকিত। এখানে তাঁহার মনের অভ্যন্তরস্থ ভাবটি আর বাহিরের ভাবটি প্রায় একরূপই হইত — শান্তি সুখ আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। তাই তাঁহার সান্নিধ্যে ভক্তগণের মনেও অজানিতভাবে তাঁহার এই সুখ শান্তি ও আনন্দময় ভাবটি সঞ্চারিত হইত।

জগন্নাথ-পুরীতেও শ্রীম-র মনের স্বাভাবিক সুখ, শান্তি ও আনন্দময় ভাবকে সাধু ও ভক্ত ব্রহ্মচারীগণের সমস্যা চঞ্চল করিতে পারিত না। এখানে শ্রীম-র বাহ্য মনটি ভগবৎলীলার সেবায় চঞ্চল হইলেও উহা বৈষয়িক সমস্যার দ্বারা যেরূপ চঞ্চল হয় সেইরূপ হইত না। পুরীতে শ্রীমকে দেখা যাইত, সাধারণ সরলবিশ্বাসী একটি ভক্তের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ। তাঁহার নিত্য জগন্নাথদর্শন ও অন্যান্য পার্শ্বদেবতাগণের দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমায় চাঞ্চল্য দেখা গেলেও ঐ চাঞ্চল্য সাধু ভক্তগণের মনের উপর ঈশ্বরীয় ভাবপ্রসূত স্থৈর্য্যের উদ্রেক করিত। তাহাতে সাধু ও ভক্তগণ ঈশ্বরীয় আনন্দে আপ্লুত হইতেন। একজন অযুক্ত প্রাকৃত লোকের সাংসারিক বিষয়ে চঞ্চল মনের প্রতিক্রিয়া অপর একজন সাংসারিক লোকের মনে সর্বদা চঞ্চলতারই সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্রীম-র ঈশ্বরীয় লীলাদি দর্শনের জন্য যে চাঞ্চল্য তাহা ভক্তদের মনে সাংসারিক ও বৈষয়িক সমস্যাজনিত চাঞ্চল্যের মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত দৈবী আনন্দ ও শান্তিময় ভাবরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিত। পুরীতে শ্রীম সর্বদাই ভগবৎলীলা দর্শন, স্মরণ ও প্রণামাদিতে চঞ্চল। তাই তাঁহার ঈশ্বরদর্শনজনিত অন্তরের প্রশান্ত ভাবটি এইরূপ বাহ্য দৈবী চঞ্চলতার

সহিত মিলিত হইলেও সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকিত।

সাধু ব্রহ্মচারীগণ শ্রীম-র এই বিভিন্ন ভাববিপর্যয়ের ভিতরও তাঁহার স্বাভাবিক ভাবটি এবং বাহ্য মনটি একই আনন্দময় সূত্রে গ্রথিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, কি করিয়া মনের এই সাম্য রক্ষিত হয়! তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, যাঁহাদের 'মন্দিরে মাধব' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারাই সদা এ রকম আনন্দময়। অতএব শ্রীম ও ঠাকুরের পার্ষদগণের সহায়তায় আমাদের মনেও এই 'মাধব' প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, এই জীবনেই। এই সঙ্কল্পটি সাধু ব্রহ্মচারীগণ গ্রহণ করিতেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বেদান্তোক্ত চারিটি যোগসাধনেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন নিজের কাছে রাখিয়া — জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। শ্রীমকে এই চার যোগেই specialised (পারদর্শী) দেখিতে পাইতাম যদিও তাঁহার নিজস্ব ভাব শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমাভক্তি।

জগদম্বার নির্দেশে শ্রীমকে ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থ আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীম আচার্য। লোকশিক্ষায় ঈশ্বরীয় নানাভাবের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই ঠাকুর তাঁহাকে নানা ঈশ্বরীয়ভাবে পারদর্শী করেন। সাকার ও নিরাকার দর্শনে দীক্ষিত করেন। আর লৌকিক জ্ঞানে তো তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট খ্যাতি ও উপাধিতে মণ্ডিত করিয়াইছিলেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে। ঠাকুর বলিতেন, নিজের প্রাণ নরুনেতেই লওয়া যায়। অপরের প্রাণ লইতে হইলেই ঢাল তলোয়ারের প্রয়োজন হয়। তাই ঠাকুর তাঁহাকে লৌকিক বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যায় যুগপৎ বিশারদ করিয়াছিলেন।

শ্রীম-দর্শনের চতুর্দশ ভাগ শ্রীম-চরিত্রের এই মধুময় দিব্যভাব বহন করে। ভক্ত বন্ধুগণ এই গ্রন্থপাঠ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরব্রহ্মের সাকার নররূপ শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিয়া দিব্য সুখ শান্তি ও আনন্দে এই সংসারকে মজার কুঠিতে পরিণত করিয়া অবস্থান করুন — গ্রন্থকারের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ওঁ রামকৃষ্ণ।

বিনীত

গ্রন্থকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ) ঋষিকেশ (হিমালয়)
দুর্গাপূজা, ১৩৭৮, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ।